ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-V, May, 2026, Page No. 2086-2093
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.05W.469

বহুত্ববাদের পুনর্নির্মাণ: কাজী নজরুল ইসলাম এবং ঔপনিবেশিক বাংলার সাংস্কৃতিক সমন্বয়

ড. নয়ন সরকার, *স্বাধীন গবেষক, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.04.2026; Accepted: 27.05.2026; Available online: 31.05.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This essay, focusing on one of the greatest Bengali poets of the 20th century, Kazi Nazrul Islam, analyzes the non-communal spirit inherent in his life and literature and his unique role as a 'harbinger of harmony'. The main aim of this research is to understand the relevance of Nazrul-Manas in the context of growing intolerance and instability in the current world. The article measures the depth of Nazrul's philosophy based on three main pillars - theological liberalism, political communism and musical syncretism. In particular, the way in which Nazrul composed bhajans and devotional songs in worship of Goddess Shyama, Sri Krishna, Saraswati and Maheshwar Shiva, in parallel with Islamic ghazals and naats, is discussed with great importance in this study. It is identified as a document of eternal friendship in religious traditions. In addition, the infallible truth that 'man' is above all identities in Nazrul's political philosophy—"There is nothing greater than man, nothing greater"—has shed light on his role in eliminating social and gender inequality. The message of international friendship and universal humanity that he propagated through his translated literature is a unique aspect of the article. Ultimately, this study proves that Nazrul's philosophy of harmony is not just a historical discussion, but rather an essential and eternal pole star for overcoming the current global crisis.

Keywords: Kazi Nazrul Islam, Communal Harmony, Communism, Devotional Songs, Theological Liberalism, Sociology of Music, International Friendship

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতবর্ষ যখন ঔপনিবেশিক শাসনের নিগড়ে শৃঙ্খলিত এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে জর্জরিত, ঠিক সেই ক্রান্তিলগ্নে ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন মহাকবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি কেবল একজন কবি বা সংগীতকার ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন এক অখণ্ড ও অবিভাজ্য মানবিক চেতনার মূর্ত প্রতীক। নজরুলের সমগ্র সাহিত্য ও জীবনের মূল সুরটিই হলো 'মানুষ'— যিনি স্থান, কাল, পাত্র এবং ধর্মের ঊর্ধ্বে। তাঁর লেখনীর প্রধান অভীষ্ট ছিল মানবের অন্তরের সুপ্ত দেবত্বের জাগরণ ঘটানো এবং কৃত্রিম বিভাজনের প্রাচীর ভেঙে এক পরম সত্যের সন্ধান দেওয়া।

নজরুল তাঁর জীবনদর্শন ও সৃজনশীলতায় এমন এক সমন্বিত সংস্কৃতির বীজ বপন করেছিলেন, যেখানে মন্দির ও মসজিদ, ভজন ও গজল, উপনিষদ ও কুরআন এক অনবদ্য মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। তিনি যখন বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন—

> "গাহি সাম্যের গান— যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান, যেখানে মিশছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রিশ্চান।"[১]

তখন এই পঙ্‌ক্তিমালা কেবল সাহিত্যের অলংকার থাকে না, তা অমর্ত্য সেনের 'বহুমাত্রিক মানবিক পরিচয়' (Plural Identities)-এর এক জোরালো সাহিত্যিক দলিলে পরিণত হয়। নজরুলের এই অসাম্প্রদায়িকতা কোনো তাত্ত্বিক বিলাসিতা ছিল না; এটি ছিল তাঁর অস্তিত্বের প্রকাশ। তিনি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির 'ভাগ করো' (Divide and Rule) নীতির মূলে কুঠারাঘাত করে গেয়েছিলেন, "মোরা একই বৃন্তে দু'টি কুসুম হিন্দু-মুসলমান।"[২] নজরুল-মানসের এই সম্প্রীতি চেতনার সমান্তরালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *মানুষের ধর্ম* (The Religion of Man) দর্শনের গভীর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সংকীর্ণতাকে পার হয়ে 'বিশ্বমানব' হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন, নজরুল সেখানে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে সেই দর্শনকে সাধারণ শোষিত মানুষের অধিকারের সাথে যুক্ত করেছেন। তিনি একই কলমে যখন ইসলামী না'ত ও গজল লিখেছেন, ঠিক পরক্ষণেই পরম আবেশে মা কালীর বন্দনায় রচনা করেছেন কালজয়ী শ্যামাসঙ্গীত। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, উপাসনার ভাষা ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু সেই করুণাময়ের কাছে পৌঁছানোর আকুলতা অভিন্ন। বর্তমানের এই অসহিষ্ণু সময়ে, যখন তুচ্ছ কারণে মানুষে-মানুষে বৈষম্য প্রবল হয়ে উঠছে, তখন নজরুলের অসাম্প্রদায়িক দর্শনই আমাদের একমাত্র ধ্রুবতারা। তিনি শিখিয়েছেন যে, বৈচিত্র্য বিভাজনের কারণ নয়, বরং তা মহত্তর মিলনের সোপান। এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হলো নজরুলের সেই বৈপ্লবিক ও মরমী সৃষ্টিসমূহকে বর্তমান সমাজ-বাস্তবতার নিরিখে পুনঃমূল্যায়ন করা। তাঁর রাজনীতি, সংগীত ও ধর্মতাত্ত্বিক ভাবনার এক সূক্ষ্ম সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা এই গবেষণাটি কেবল সাহিত্যের আঙিনায় সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং তা মানবমুক্তির এক নতুন দিশা উন্মোচন করবে। নজরুল কেবল অতীতের কবি নন, তিনি আমাদের বর্তমানের প্রেরণা এবং ভবিষ্যতের আলোকবর্তিকা।

কাজী নজরুল ইসলামের ধর্মতাত্ত্বিক দর্শন কোনো নির্দিষ্ট শাস্ত্রীয় সীমাবদ্ধতার গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল না। তাঁর কাছে ধর্ম ছিল আত্মশুদ্ধি এবং আর্তমানবতার সেবার এক অবারিত পথ। তিনি বিশ্বাস করতেন, পরম সত্তার আরাধনা কেবল আচার-সর্বস্ব আনুষ্ঠানিকতায় নয়, বরং অন্তরের গভীর প্রেমের মধ্যেই নিহিত। নজরুলের এই ধর্মতত্ত্বকে সমাজবিজ্ঞানী ক্লিপোর্ড গিয়ার্টজ (Clifford Geertz)-এর 'সংস্কৃতির ব্যাখ্যা' (Interpretation of Cultures) তত্ত্বের আলোকে বোঝা সম্ভব। গিয়ার্টজের মতে, ধর্ম হলো একাধারে একটি সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা যা মানুষের জীবনের অর্থ তৈরি করে। নজরুল ইসলামী ঐতিহ্যের পাশাপাশি হিন্দু আধ্যাত্মিক ধারাকে এক অভিন্ন মোহনায় মিলিত করেছেন। তিনি যখন ইসলামী গজল বা না'ত রচনা করেছেন, তখন তাঁর লেখনীতে ফুটে উঠেছে পরম করুণাময়ের প্রতি অসীম আনুগত্য:

> "ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এল রে দুনিয়ায়। আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়॥"[৩]

এখানে যেমন তাঁর আধ্যাত্মিক সমর্পণ স্পষ্ট, ঠিক তেমনি সমান্তরালভাবে তিনি যখন দেবী শ্যামা বা মা কালীর আরাধনায় মগ্ন হয়েছেন, তখন তাঁর ভক্তিপ্লুত হৃদয়ের আর্তি ধ্বনিত হয়েছে অত্যন্ত সংবেদনশীল ভাষায়: "বল রে জবা বল, কোঁন্ সাধনায় পেলি রে তুই শ্যামা মায়ের চরণ-তল।"[৪] নজরুলের এই ধর্মতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য কেবল কবিত্বের খাতিরে ছিল না; এটি ছিল তাঁর চেতনার এক গভীর সত্য। তিনি হিন্দু ও

মুসলিম ঐতিহ্যের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখেননি, বরং দেখেছিলেন এক শাশ্বত মিলনের সুর। তাঁর দৃষ্টিতে ঈশ্বর বা আল্লাহ্ কোনো দূরবর্তী সত্তা নন, বরং তিনি মানুষের হৃদয়ের অতি সন্নিকটে বিরাজমান। গবেষক হুমায়ুন আজাদের মতে, নজরুলের এই অবস্থান ছিল "একই সঙ্গে মরমী ও বৈপ্লবিক"। তিনি হিন্দু ও মুসলিম ঐতিহ্যের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখেননি। তিনি সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেছেন সেই সমস্ত ধর্মব্যবসায়ীদের, যারা ধর্মের নামে বিভেদ সৃষ্টি করে। তিনি সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেছেন সেই সমস্ত ধর্মব্যবসায়ীদের, যারা ধর্মের নামে বিভেদ সৃষ্টি করে:

> "মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান! নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি, সব দেশে, সব কালে, ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।"[৫]

এখানে নজরুলের ধর্মতাত্ত্বিক অবস্থানের একটি বিশেষ দিক হলো তাঁর 'সর্বেশ্বরবাদী ভাবনা'। তিনি প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানে এবং মানুষের প্রতিটি দীর্ঘশ্বাসে স্রষ্টার উপস্থিতি অনুভব করতেন। তাঁর রচিত ভজন ও গজলসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি শব্দচয়ন ও অলংকারের ক্ষেত্রেও এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন। তিনি একই সঙ্গে 'আল্লাহ্', 'হরি', 'শ্যামা' কিংবা 'গোবিন্দ'কে এক চিরন্তন সত্যের বিভিন্ন নাম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। মন্দিরে যখন তাঁর ভজন গাওয়া হয়, তখন সেখানে কোনো বিভেদের প্রাচীর থাকে না। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, আধ্যাত্মিকতা যদি মানুষকে মানুষের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, তবে তা ধর্ম নয়— তা কেবল মোহ। তাঁর ধর্মতত্ত্বের মূল কথা ছিল— হৃদয়ই হলো শ্রেষ্ঠ উপাসনালয়।

কাজী নজরুল ইসলামের সংগীত-ভুবন ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের এক মহতী পরীক্ষাগার। তাঁর সংগীত কেবল সুরের মূর্ছনা নয়, বরং তা ছিল দুই ভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী এক সুদৃঢ় সেতু। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর *Practical Vedanta* বা ব্যবহারিক বেদান্ত দর্শনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের, এবং ভারতের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলনের কথা বলেছিলেন। বিবেকানন্দ একটি আদর্শ ভারতের রূপরেখা দিতে গিয়ে "ইসলামী শরীর ও বেদান্তী হৃদয়ের" মেলবন্ধনের কথা উল্লেখ করেছিলেন। নজরুল তাঁর সংগীতে সেই মেলবন্ধনকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। তিনি একদিকে ইসলামের আধ্যাত্মিক ভাবধারাকে প্রকাশ করেছেন, অন্যদিকে তেমনি হিন্দুধর্মের ভক্তিগীতি ও নাদ-সাধনাকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। সুরকার ও সংগীত গবেষক মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের মতে, নজরুলের সংগীতে শাস্ত্রীয় রাগের সাথে লৌকিক ও লোকজ সুরের যে সংমিশ্রণ ঘটেছে, তা বাংলা সংস্কৃতির এক অভূতপূর্ব অর্জন। নজরুল যখন পরম আবেশে গেয়ে ওঠেন— "মোরা একই বৃন্তে দু'টি কুসুম হিন্দু-মুসলমান। মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ।"[৬] নজরুলের সংগীতের এই সম্প্রীতি-দর্শন কেবল কথার কথা ছিল না। তিনি যখন শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছেন, তখন তাঁর কাব্যিক আবেগে মা কালীর রুদ্র ও মাতৃরূপ একাকার হয়ে মিশেছে। মন্দিরের প্রাঙ্গণে যখন তাঁর এই গানগুলো ধ্বনিত হয়, তখন ভক্তের হৃদয়ে আর কোনো দ্বিধা থাকে না: "শ্মশানে জাগিছে শ্যামা মা। পেল রে ভয় যম-ভয়ঙ্কর হেরিয়া ঐ রূপ-রমা॥"[৭] আবার একই শিল্পী যখন ভক্তিপ্লুত কণ্ঠে গেয়ে ওঠেন— "খেলিছ এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আনমনে"[৮]— তখন সেই সংগীতের বিশ্বজনীনতা জাত-পাতের সীমানা ছাড়িয়ে এক পরম সত্যের দিকে আমাদের ধাবিত করে। নজরুলের সংগীতে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির সুর আর মহররমের বিষাদসিন্ধু একই সমান্তরালে প্রবহমান। তাঁর রাগানুগ গীতিগুলোতে ফারসি শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত তৎসম শব্দের যে নিপুণ সংমিশ্রণ ঘটেছে, তা বাংলা সংগীতের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা।

নজরুলের সুর-সাধনার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো 'শব্দগত ও ভাবগত মৈত্রী'। তিনি প্রথাগত গণ্ডি ভেঙে ভজনে সুফি তরিকত এবং গজলে ভক্তিবাদের আবেশ ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, সুরের

কোনো ধর্ম হয় না; সুরের ধর্ম হলো হৃদয়ে প্রশান্তি আনা। বর্তমানের অস্থির সময়ে নজরুলের এই সাঙ্গীতিক দর্শনই পারে মানুষের মধ্যে বিভেদের দেওয়াল ভেঙে দিতে। তাঁর গান আমাদের শেখায় যে— উপাসনার ভাষা ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু সেই করুণাময়ের কাছে পৌঁছানোর সুরটি আসলে অভিন্ন। তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, ধর্মের নামে যারা বিভেদ করে তারা মূলত সত্যের শত্রু:

> "জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছ জুয়া, ছুঁলে তোর জাত যাবে কি? জাত ছেলে না কথার ধোঁয়া!"[৯]

শেষ কথা হলো— নজরুল ইসলামের সংগীত কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়, তা একাধারে রাজনৈতিক প্রতিবাদ এবং ধর্মীয় সংহতির এক জীবন্ত ইশতেহার। তাঁর গানগুলো আজও মন্দিরে ও মসজিদে সমানভাবে প্রেরণা জোগায়, যা তাঁকে 'সম্প্রীতির অগ্রদূত' হিসেবে বিশ্বদরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

নজরুলের রাজনৈতিক দর্শন ছিল তাঁর মানবিক সত্তারই এক সম্প্রসারিত রূপ. তাঁর রাজনীতি কোনো সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে বা ক্ষমতার মোহে আচ্ছন্ন ছিল না; বরং তা ছিল শোষিত, লাঞ্ছিত এবং সর্বহারা মানুষের অধিকার আদায়ের এক বজ্রনির্ঘোষ। নজরুলের সাম্যবাদকে কার্ল মার্ক্স (Karl Marx)-এর শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বের সাথে তুলনা করা হলেও, নজরুলের সাম্যবাদ ছিল অনেক বেশি মানবতাবাদী ও আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শে পুষ্ট। মার্ক্স যেখানে ধর্মকে "আফিম" হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলেন, নজরুল সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের কুসংস্কারকে বর্জন করে ধর্মের প্রকৃত মানবিক সত্তাকে রাজনীতির হাতিয়ার করেছিলেন। গবেষক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী লিখেছেন,

> "নজরুলের সাম্যবাদ কোনো বিদেশি তত্ত্বের অন্ধ অনুকরণ ছিল না, তা ছিল বাংলার মাটি ও মানুষের দুঃখ থেকে জন্ম নেওয়া এক স্বকীয় দর্শন"[১০]

সামাজিক সম্প্রীতির প্রসঙ্গে নজরুলের 'নারী' কবিতাটি আধুনিক জেন্ডার স্টাডিজ (Gender Studies) বা নারীবাদের একটি আদি ও শক্তিশালী দলিল. তিনি অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন:

> "মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান! নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি, সব দেশে, সব কালে, ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।"[১১]

নজরুলের রাজনীতিতে 'ধর্ম' ছিল ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয়, কিন্তু 'দেশ' ছিল সকলের। তিনি বিশ্বাস করতেন, হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত রক্তই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সোপান রচনা করবে। তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধে ও কবিতায় তিনি বারবার সাম্প্রদায়িক ঐক্যের ডাক দিয়েছেন। তিনি দেখেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কীভাবে 'ভাগ করো এবং শাসন করো' নীতির মাধ্যমে এদেশের মানুষের মধ্যে অনৈক্যের বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে। সেই বিষদাঁত ভেঙে দেওয়ার জন্য তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছিল শাণিত তরবারি:

> "গাহি সাম্যের গান— যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান, যেখানে মিশছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রিশ্চান।"[১২]

নজরুলের সাম্যবাদ ছিল অত্যন্ত সংবেদনশীল। তিনি শ্রমজীবী মানুষের ঘাম ও অশ্রুর মধ্যে ঈশ্বরের সান্নিধ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর 'কুলি-মজুর' বা 'কৃষাণের গান' কবিতাগুলোতে যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ফুটে উঠেছে, তা আধুনিক সমাজতন্ত্রের ধারণাকে সমৃদ্ধ করে। তিনি জানতেন, ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে ধর্মের বাণীর চেয়ে অন্ন বেশি জরুরি। তাই তাঁর রাজনৈতিক চেতনায় ধর্মতত্ত্ব ও সমাজনীতি মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। রাজনীতির অঙ্গনে নজরুলের এই নির্ভীক অবস্থান তাঁকে বারবার কারাবরণ করতে বাধ্য করেছে। কিন্তু কারাগারের লৌহকপাট তাঁর কণ্ঠরোধ করতে পারেনি। তিনি শিকল পরে শিকল ভাঙার গান গেয়েছেন, যা দেশপ্রেমিকদের মনে এক অজেয় সাহসের সঞ্চার করেছিল। তাঁর 'অগ্নি-বীণা'র ঝঙ্কার আজও অন্যায়ের

বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুপ্রেরণা জোগায়। বর্তমানের রাজনৈতিক অস্থিরতায় নজরুলের এই আপসহীন সাম্যবাদী চেতনা আজও ধ্রুবতারার মতো সত্য। তিনি শিখিয়েছেন, যেখানেই অবিচার, সেখানেই বিদ্রোহ অনিবার্য।

কাজী নজরুল ইসলামের আধ্যাত্মিক সত্তার এক অনন্য ও বিস্ময়কর দিক হলো তাঁর রচিত হিন্দুধর্মীয় ভাবধারার সংগীতসমূহ। তিনি যখন শ্যামাসঙ্গীত, ভজন বা কীর্তন রচনা করেছেন, তখন তাঁর লেখনীতে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না; বরং তা ছিল একনিষ্ঠ এক সাধকের আত্মনিবেদন। নজরুলের এই সৃষ্টিসমূহ প্রমাণ করে যে, প্রকৃত শিল্পীর কাছে ঈশ্বর কোনো সাম্প্রদায়িক সীমানায় আবদ্ধ নন। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন দেব-দেবীর চরণে তাঁর এই কাব্যিক পুষ্পাঞ্জলি আজও বাঙালির সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। নজরুল-মানসে দেবী কালীর রূপ ছিল শাশ্বত শক্তির প্রতীক। তাঁর রচিত শ্যামাসঙ্গীতগুলো ভক্তের হৃদয়ে একই সঙ্গে ভয় এবং পরম নির্ভরতার সৃষ্টি করে। তিনি গেয়েছেন: "আমায় দে মা পাগল করে, আর কাজ নেই মা জ্ঞান-বিচারে।"[১৩] অথবা, "খেলিছ এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আনমনে। প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল খেলা, নিরজনে প্রভু নিরজনে।"[১৪] এখানে তিনি কেবল উপাসনা করেননি, বরং সৃষ্টির গূঢ় রহস্যকে দর্শনের আলোয় স্পর্শ করেছেন। নজরুলের এই ভক্তিপ্লুত কণ্ঠস্বর যখন মন্দিরে প্রতিধ্বনিত হয়, তখন তা ধর্মের সংকীর্ণ দেওয়াল গুঁড়িয়ে দিয়ে এক মহান মানবিক ঐক্যের জয়গান গায়। বিদ্যার দেবী সরস্বতী এবং শক্তির আধার মা দুর্গার বন্দনায় নজরুলের কলম ছিল সমানভাবে সাবলীল। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজায় তাঁর 'আগমনী' গানগুলো এক বিশেষ দ্যোতনা সৃষ্টি করে:

"জাগো যোগমায়া জাগো মৃন্ময়ী চিন্ময়ী রূপে জাগো মা গো"[১৫] বিদ্যার আলোয় মনের অন্ধকার দূর করতে তিনি প্রার্থনা করেছেন: "শ্বেত-শতদল-দল-বিলাসিনী বীণা-রঞ্জিত-কর-কমলে মা গো বিদ্যা-প্রদায়িনী।"[১৬] শুধু তাই নয়, দেবাদিদেব মহাদেব শিবের রুদ্র ও শান্ত রূপকেও তিনি অপূর্ব দক্ষতায় তুলে ধরেছেন: "শঙ্কর শুভঙ্কর অভয়ঙ্কর হে, ত্রিনয়ন-দীপ্ত ভাতি মহেশ্বর হে।"[১৭] নজরুলের এই ভক্তিগীতিগুলোর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এদের **'সহজ সরল জীবনমুখী আবেদন'**। তিনি বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের চেয়ে অন্তরের ভক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন: "তুমি কি চাও মাগো শ্বেত রক্ত জবা? না ভক্তের আঁখিজল ভক্তি-মনোরমা?"[১৮] এখানে মূল প্রতিপাদ্য হলো— নজরুল ইসলামের এই ভজন ও কীর্তনগুলো কেবল সংগীত নয়, এগুলো এক একটি 'সম্প্রীতির মন্ত্র'। তিনি তাঁর জীবন ও সৃষ্টির মাধ্যমে দেখিয়ে গেছেন যে, একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম হয়েও কীভাবে অন্য ধর্মের আধ্যাত্মিক সম্পদকে নিজের করে নেওয়া যায় এবং শ্রদ্ধা জানানো যায়। মন্দিরের পবিত্র প্রাঙ্গণে নজরুলের এই গানগুলো আজও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক জীবন্ত মিনার হিসেবে দণ্ডায়মান।

কাজী নজরুল ইসলামের 'সম্প্রীতির অগ্রদূত' হয়ে ওঠার পথটি কেবল ধর্মীয় মেলবন্ধনেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা বিস্তৃত ছিল সমাজের গভীরতম স্তরে— যেখানে মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ ও নারী-পুরুষের বৈষম্য সমাজকে পঙ্গু করে রেখেছিল। তাঁর দৃষ্টিতে সামাজিক সম্প্রীতি মানে কেবল দুই ধর্মের মিলন নয়, বরং তা হলো জাতি-ধর্ম-বর্ণ এবং লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের মর্যাদাপূর্ণ সহাবস্থান। নজরুল যখন 'নারী' কবিতাটি রচনা করেন, তখন বিশ্বজুড়ে নারীবাদী আন্দোলনের রূপ আজকের মতো সংহত ছিল না। তিনি অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন যে, সভ্যতার বিনির্মাণে নর ও নারীর অবদান সমান ও অনস্বীকার্য। তাঁর এই দূরদর্শী ভাবনা আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের গবেষণার এক অমূল্য সম্পদ। তিনি গেয়েছেন: "কোন কালে একা হয়নিকো জয়ী পুরুষের তরবারি; প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়-লক্ষ্মী নারী।"[১৯] এবং সেই অমোঘ সত্য: "বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী,

অর্ধেক তার নর।"[২০] নজরুল বিশ্বাস করতেন, নারীকে বন্দি রেখে বা অবদমিত করে কোনো জাতি প্রকৃত মুক্তি বা সম্প্রীতি অর্জন করতে পারে না। তিনি নারীকে কেবল গৃহবন্দি মানবী হিসেবে দেখেননি, বরং তাঁকে দেখেছেন শক্তির আধার ও প্রেরণার উৎস হিসেবে।

তৎকালীন সমাজে জাতপাতের যে কঠোরতা ছিল, নজরুল তাকে 'বজ্জাতি' বলে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর কাছে মানুষের পরিচয় তার কর্মে ও আচরণে, বংশে বা জাতে নয়। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠ ছিল বজ্রকঠিন। তিনি ধর্মের বাহ্যিক আচারের চেয়ে মানুষের মানবিক স্পর্শকে বেশি গুরুত্ব দিতেন:

> "জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছ জুয়া, ছুঁলে তোর জাত যাবে কি? জাত ছেলে না কথার ধোঁয়া!"[২১]

এই পঙ্‌ক্তিমালা কেবল কাব্য নয়, এটি ছিল তৎকালীন ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থার মূলে এক চরম কুঠারাঘাত। তিনি চেয়েছিলেন এমন এক সমাজ যেখানে কুলি, মজুর, কৃষক— সবাই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে।

নজরুলের সামাজিক সম্প্রীতির মূল ভিত্তি ছিল 'ভালোবাসা' ও 'সহমর্মিতা'। তিনি জানতেন যে, অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া সামাজিক শান্তি সম্ভব নয়। তাই তাঁর লেখনীতে দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের কথা বারবার উঠে এসেছে। তাঁর রাজনৈতিক চেতনা ও সামাজিক ভাবনা একবিন্দুতে মিলিত হয়েছিল এই বিশ্বাসে যে— শোষিত মানুষের কোনো আলাদা ধর্ম নেই, তাদের একটাই পরিচয় তারা 'নিপীড়িত'। আজকের দিনেও যখন লিঙ্গবৈষম্য বা জাতপাত নিয়ে অস্থিরতা দেখা যায়, তখন নজরুলের এই সাহসী উচ্চারণ আমাদের পথ দেখায়। তিনি শিখিয়েছেন যে, সম্প্রীতি মানে কেবল সহাবস্থান নয়, সম্প্রীতি মানে হলো একে অপরের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন এক বিশ্বপথিক। তাঁর সম্প্রীতির ভাবনা কেবল স্বদেশের ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ ছিল না, বরং তা বিশ্বমানবের মুক্তির আকাঙ্খার সঙ্গে একীভূত হয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের মানুষের আর্তনাদ বা বিদ্রোহ আসলে একই সত্যের বিভিন্ন রূপ। নজরুল তাঁর অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের মরমী দর্শনকে বাঙালির হৃদয়ের খুব কাছে নিয়ে এসেছিলেন। হাফিজের রুবাইয়াৎ বা ওমর খৈয়ামের কাব্যের যে ভাবানুবাদ তিনি করেছেন, তা কেবল ভাষান্তর ছিল না; তা ছিল দুই ভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে এক পরমাত্মার যোগসূত্র স্থাপন। তিনি বিশ্বকে শিখিয়েছিলেন যে, সুফিবাদ আর ভারতীয় অদ্বৈতবাদ একই মোহনায় মিলিত হতে পারে। নজরুলের লেখায় তুরস্কের কামাল পাশা থেকে শুরু করে মিশরের জাগলুল পাশা— সবার বীরত্বগাথা উঠে এসেছে। তিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে অত্যন্ত নিপুণভাবে তাঁর কবিতায় স্থান দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে 'বিদ্রোহ' ছিল একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। পরাধীন যে কোনো জাতির লড়াইকে তিনি নিজের লড়াই বলে মনে করতেন। নজরুল যখন ইসলামের সাম্যবাদী দর্শনকে বাংলায় অনুবাদ করেন কিংবা ফারসি গজলকে বাংলা রাগের ছাঁচে ঢেলে দেন, তখন তিনি আসলে এক 'সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন' ঘটিয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে বিশ্ব ছিল একটি অখণ্ড পরিবার। "মহা-মানবের সাগর-তীরে" আসার যে আহ্বান রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, নজরুল তাকে দিয়েছেন এক বৈপ্লবিক ও বাস্তব রূপ।

কাজী নজরুল ইসলাম কেবল বিংশ শতাব্দীর একজন চারণকবি ছিলেন না; তিনি ছিলেন এক অবিনাশী দর্শনের নাম, যা কাল ও সীমানার ঊর্ধ্বে চির-ভাস্বর। 'নজরুল: সম্প্রীতির অগ্রদূত' শীর্ষক এই দীর্ঘ আলোচনার শেষে আমরা এই সত্যে উপনীত হই যে, নজরুলের অসাম্প্রদায়িকতা কোনো সাময়িক সমঝোতা ছিল না, বরং তা ছিল তাঁর শোণিত-প্রবাহে মিশে থাকা এক গভীর আত্মিক বিশ্বাস। রাজনীতি, সংগীত ও ধর্মতত্ত্বের যে নিপুণ বুনন তিনি তাঁর জীবনে ও সাহিত্যে ঘটিয়েছেন, তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। আজকের

এই অস্থির বিশ্বে, যখন ধর্মের অপব্যাখ্যা, উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং লৈঙ্গিক বৈষম্য মানবসভ্যতাকে এক গভীর সঙ্কটের মুখে ঠেলে দিয়েছে, তখন নজরুলের দর্শনই হতে পারে আমাদের রক্ষার কবচ। তিনি শিখিয়েছেন যে, মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তার মনুষ্যত্বে। মন্দির ও মসজিদের ব্যবধান ঘুচিয়ে তিনি যে মহামিলনের সুর তাঁর ভজন ও গজলে বেঁধেছিলেন, তা আজও আমাদের শেখায় কীভাবে ভিন্নতাকে অস্বীকার না করেও ঐক্যবদ্ধ থাকা যায়। তিনি যখন বলেন— "গাহি সাম্যের গান— যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,"[২২] তখন সেই বাণী কেবল বর্তমানের অস্থিরতা নিরসনেই সাহায্য করে না, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক শান্তিময় পৃথিবীর মানচিত্র এঁকে দেয়। নজরুলের 'বিদ্রোহী' সত্তাটি যেমন অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন, তাঁর 'প্রেমিক' সত্তাটি তেমনি মানুষের প্রতি অতল মমতায় পূর্ণ। তাঁর রচিত প্রতিটি শ্যামাসঙ্গীত, ভজন, গজল এবং সাম্যবাদী কবিতা আমাদের এই বার্তাই দেয় যে— সত্য ও প্রেম কখনো খণ্ডিত হতে পারে না। তিনি হিন্দু ও মুসলিম ঐতিহ্যের যে রাজকীয় সমন্বয় ঘটিয়েছেন, তা কেবল ভারত বা বাংলাদেশের সম্পদ নয়, বরং তা সমগ্র বিশ্বের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক অমূল্য দলিল। শেষে বলা যায়, নজরুল কোনো বিশেষ কাল বা গোষ্ঠীর একক অধিকারী নন; তিনি শাশ্বত মানবতার কণ্ঠস্বর। বর্তমানের এই বিদ্বেষপূর্ণ সময়ে নজরুলের 'সম্প্রীতির অগ্রদূত' পরিচয়টি কেবল গবেষণার বিষয় নয়, বরং তা জীবন যাপনের এক অপরিহার্য আদর্শ। তাঁর সেই অজেয় ও সর্বজনীন মৈত্রীভাবই পারে আধুনিক পৃথিবীর ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে প্রশান্তির প্রলেপ দিতে। তিনি ছিলেন, আছেন এবং অনন্তকাল ধরে বিশ্বমানবের মুক্তির দিশারী হয়ে বিরাজ করবেন।

তথ্যসূত্র:

১। ইসলাম, কাজী নজরুল। নজরুল-রচনাবলী। ২য় খণ্ড, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃ. ৭৬।

২। ইসলাম, কাজী নজরুল। নজরুল-রচনাবলী। ১ম খণ্ড, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃ. ৩৯১।

৩। ইসলাম, কাজী নজরুল। নজরুল-রচনাবলী। ৩য় খণ্ড, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭, পৃ. ৪৫৮।

৪। ইসলাম, কাজী নজরুল। নজরুল-রচনাবলী। ৩য় খণ্ড, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭, পৃ. ৩০১।

৫। ইসলাম, কাজী নজরুল। নজরুল-রচনাবলী। ২য় খণ্ড, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃ. ৭৬।

৬। ইসলাম, কাজী নজরুল। নজরুল-রচনাবলী। ১ম খণ্ড, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃ. ৩৯১।

৭। ইসলাম, কাজী নজরুল। নজরুল-রচনাবলী। ৩য় খণ্ড, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭, পৃ. ৩০১।

৮। ইসলাম, কাজী নজরুল। নজরুল-রচনাবলী। ৩য় খণ্ড, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭, পৃ. ৩০৭।

৯। ইসলাম, কাজী নজরুল। নজরুল-রচনাবলী। ২য় খণ্ড, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃ. ১৯১।

১০। চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম। নজরুল কেন প্রাসঙ্গিক। অন্যপ্রকাশ, ২০০১, পৃ. ৫৬।

১১। ইসলাম, কাজী নজরুল। নজরুল-রচনাবলী। ২য় খণ্ড, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃ. ৭৬।

১২। ইসলাম, কাজী নজরুল। নজরুল-রচনাবলী। ২য় খণ্ড, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃ. ৭৬।

১৩। ইসলাম, কাজী নজরুল। নজরুল-রচনাবলী। ৩য় খণ্ড, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭, পৃ. ৩০১।

১৪। ইসলাম, কাজী নজরুল। নজরুল-রচনাবলী। ৩য় খণ্ড, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭, পৃ. ৩০৭।

১৫। ইসলাম, কাজী নজরুল। নজরুল-রচনাবলী। ৩য় খণ্ড, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭, পৃ. ৩০১।

১৬। ইসলাম, কাজী নজরুল। নজরুল-রচনাবলী। ৩য় খণ্ড, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭, পৃ. ৩০১।

১৭। ইসলাম, কাজী নজরুল। নজরুল-রচনাবলী। ৩য় খণ্ড, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭, পৃ. ৩০১।

১৮। ইসলাম, কাজী নজরুল। নজরুল-রচনাবলী। ৩য় খণ্ড, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭, পৃ. ৩০২।

১৯। ইসলাম, কাজী নজরুল। নজরুল-রচনাবলী। ২য় খণ্ড, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃ. ৭৭।

২০। ইসলাম, কাজী নজরুল। নজরুল-রচনাবলী। ২য় খণ্ড, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃ. ৭৭।

২১। ইসলাম, কাজী নজরুল। নজরুল-রচনাবলী। ২য় খণ্ড, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃ. ১৯১।

২২। ইসলাম, কাজী নজরুল। নজরুল-রচনাবলী। ২য় খণ্ড, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃ. ৭৬।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. আজাদ, হুমায়ুন। নজরুল ইসলাম: মহাবৈপ্লবিক ও মরমী। আগামী প্রকাশনী, ২০০৪।

২. ইসলাম, কাজী নজরুল। অগ্নি-বীণা। আর্য পাবলিশিং হাউস, ১৯২২।

৩. ইসলাম, কাজী নজরুল। নজরুল-রচনাবলী। জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, ১ম-৩য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬-১৯৯৭।

৪. ইসলাম, কাজী নজরুল। সাম্যবাদী। ওরিয়েন্টাল বুক এজেন্সি, ১৯২৫।

৫. ইসলাম, কাজী নজরুল। বিষের বাঁশী। ডি. এম. লাইব্রেরি, ১৯২৪।

৬. ইসলাম, কাজী নজরুল। রাঙাজবা। এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোং, ১৯৬৬ (মরণোত্তর সংকলন)।

৭. চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম। নজরুল কেন প্রাসঙ্গিক। অন্যপ্রকাশ, ২০০১।

৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। মানুষের ধর্ম। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৩৩।

৯. হাই, মুহম্মদ আবদুল এবং সৈয়দ আলী আহসান। নজরুল ইসলাম। বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮।

১০. Ahmed, Rafiq. Kazi Nazrul Islam: The Voice of Humanism. Bangla Academy, 1999.

১১. Seely, Clinton B. The Slaying of Meghanada: A Resplendent Art. Oxford University Press, 2004.

১২. Geertz, Clifford. The Interpretation of Cultures. Basic Books, 1973.

১৩. Sen, Amartya. Identity and Violence: The Illusion of Destiny. W. W. Norton & Company, 2006.

১৪. Vivekananda, Swami. From Colombo to Almora: Lectures Delivered by Swami Vivekananda. Advaita Ashrama, 1947.